প্র কা শ ক থা

অরুণ সেন (১৯৩৬-২০২০) প্রতিক্ষণ পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে *চার ইয়ারি কথা* লিখছিলেন যখন, সে সময়েই ফিচারগুলি পাঠকদের মধ্যে ঔৎসুক্য ও বিতর্কের জন্ম দিয়েছিল। মূলত পাঠকদের আগ্রহেই প্রতিক্ষণ ফিচারগুলিকে বইয়ের আকারে সংকলিত করে ১৯৯৪ সালে। দীর্ঘ তিনটি দশক পেরিয়ে বইটি পুনঃপ্রকাশিত হচ্ছে, এ আমাদের কাছে আনন্দের বই-কি। ধারাবাহিকটির জন্য পূর্ণেন্দু পত্রী ও সুব্রত চৌধুরী-কৃত অলংকরণগুলিকেই আমরা এই বইটিতে ব্যবহার করেছি।

বইটিতে অরুণ সেন অনুসৃত বানানবিধি অক্ষুণ্ণ রাখা হয়েছে। উচ্চারণের ক্ষেত্রেও তাই। যেমন, ১৯৮৫ সালে *ডন কুইক্‌জোট* নামটিই বহুল-উচ্চারিত ছিল, এখনকার মতো *দন কিহোতে* নয়।

নির্বাহী সম্পাদক
প্রতিক্ষণ
জানুয়ারি, ২০২৪

মুখবন্ধ

১৯৮৫-র ১৭ জুলাই থেকে ১৯৮৬-র ১৭ জুন পর্যন্ত প্রতিক্ষণে প্রায় একবছর ধরে বেরিয়েছিল 'চার ইয়ারি কথা'। সমকালীন সাহিত্য ও লেখালেখি নিয়ে চার বন্ধুর কাল্পনিক আড্ডা ও সংলাপ। মুদ্রিত ওই আঠারোটির সঙ্গে আরো গোটা দুয়েক জুড়ে এবং ঈষৎ নামটি বদলে বের হল এই 'চার ইয়ারি আড্ডা'। সামান্য সংযোজনা ও পরিমার্জনা করা হলেও লেখাগুলো মোটামুটি অপরিবর্তিত হয়ে গেছে—তাই পড়তে গিয়ে রচনার সময়টা মাথায় রাখা ভালো। প্রকাশকালে ধারাবাহিক ফিচারের প্রতিটির জন্য বরাদ্দ ছিল মাত্র এক পৃষ্ঠা—তার মধ্যে আড্ডা জমে ওঠা মুশকিল। শুরু হতে-হতেই ফুরিয়ে যায়। প্রসঙ্গ ওঠে মাত্র, দানা বাঁধতে পারে না। তবে আড্ডার তো সেটাও একটা বৈশিষ্ট্য।

বাহুল্য হলেও বলা দরকার, আড্ডার কোনো চরিত্রের মতমন্তব্যের সঙ্গে লেখকের ভাবনার মিল খুঁজতে গেলে খুবই ভুল করা হবে। সেটুকু কৌতুকবোধ পাঠকের কাছে প্রত্যাশিত।

অরুণ সেন
জানুয়ারি, ১৯৯৪

সূচি

রবিবারের সকাল	১৩
মুকুলের মনখারাপ	১৮
ডন কুইক্‌জোটের লড়াই	২৩
কবিতার তফাৎ	২৮
দেশ ও কালের আভা	৩৩
আবৃত্তি নিষিদ্ধ করতে চায় শিশির	৩৮
পূজা ছাইত্য	৪৩
সবচেয়ে বড় ঘটনা জীবনানন্দ	৪৮
কবির লেখা উপন্যাস	৫৩
‘আপনার মুখ আপনি দেখো’	৫৮
শরৎচন্দ্র ও চোখের জল	৬৪
বইমেলার খোঁয়ারি	৬৯
ভালো লেখার সমঝদারি	৭৪
পঁচিশের খেলা	৭৯
একটি অসম্পূর্ণ তর্ক	৮৫
রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে দুষ্টুমি	৯১
তথ্যের আড়ালে-আবডালে	৯৭
ভিক্‌তোরিয়ার সন্ধানে অনামিকা	১০২
কাগজের আপিসে সাহিত্য!	১০৭
ছুটির ঘণ্টা	১১৩

রবিবারের সকাল

অমলেন্দুর বাড়ির রবিবারের সকালের আড্ডাটা ক্রমশই ওর লম্বা হলঘরের কোণের দিকে সরে যাচ্ছিল। শেষকালে পাশের পড়ার ঘরে গিয়েই ঠাঁই নিল। সকালে বাচ্চাদের একটা ছবি আঁকার ক্লাস খুলেছে সে। আড্ডার সদস্যরা—নিয়মিত সদস্য বলতে তো চারজন—বেশ বেলা করেই যায়। পাইকপাড়ায় যেতে-যেতে বেলা তো হবেই। তখনো নির্দিষ্ট সময় পার করে দু-চারজন, দেখা যায়, কাগজ তুলি রং ছড়িয়ে একমনে এঁকে চলেছে কিংবা একটু-আধটু গল্পগুজব করছে। আড্ডার কথাবার্তাকে ভাসিয়ে অন্যপ্রান্তের কাকলি মাঝে-মাঝেই কানে এসে পৌঁছয়।

কথাবার্তা বেজায় সিরিয়াস, শিল্প সাহিত্য সমাজ এইসব নিয়ে। সাহিত্য নিয়েই মূলত, কারণ আড্ডার সদস্যরা সবাই কমবেশি সাহিত্যমনস্ক, অর্থাৎ সাহিত্যই করে বা পড়ে—এই একটাই বোধহয় মিটিং পয়েন্ট। বহুদিনের বন্ধুত্ব, তাই কথায় কোনো লাগাম থাকে

না, হয়তো পারম্পর্যও। শিশির কবি মানুষ, আড্ডার নাম দিয়েছে : 'সাহিত্য, ছিন্ন সংলাপ'। কারণ এখানকার সংলাপ প্রায়ই মাঝপথে হারিয়ে যায় হাওয়ায়। মাঝে-মাঝে মুকুল বলে, "আমাদের আড্ডায় কোনো শ্যামলকৃষ্ণ ঘোষ নেই। থাকলে গত রোববার যে ভূতের গল্পটা বলেছিল অমলেন্দু তা লেখা থাকত।" শ্যামলকৃষ্ণ ঘোষের 'পরিচয়ের আড্ডা', সুধীন্দ্রনাথের আমলের পরিচয়ের গল্প, কাগজে তখন সবে বেরোতে শুরু করেছে।

অমলেন্দু বলল, "কেন অর্জুন তো আছে। সে তো ক্রিটিক, ঐতিহাসিক। এমনিতে তো তথ্যের পান থেকে চুন খসবার জো নেই।"

মুকুল বলল, "অর্জুনের মেজাজ যা কড়া, সে হবে শ্যামলকৃষ্ণ? পরিচয়ের আড্ডায় সে যদি থাকত প্রথমদিনই হারীতকৃষ্ণের সঙ্গে হাতাহাতি হয়ে যেত।"

অমলেন্দু তো বটেই, অর্জুনও হেসে ফেলে। তা সত্যিই, অর্জুন একটু নিয়মনিষ্ঠ এ ব্যাপারে—সাহিত্য নিয়ে আলোচনার মাঝে-মাঝে মুকুল আর অমলেন্দুর ফচকেমি তার মোটেই পছন্দ হয় না।

যেমন রঙ্গকৌতুক, তেমনি সহজেই চটে যাওয়া দুটোই অমলেন্দুর আসে খুব তাড়াতাড়ি। অর্থাৎ যাকে বলে উত্তেজনাপ্রবণ। কিন্তু সবই নির্দিষ্ট একটা ভাবনা ও মতামত থেকে। ব্যক্তিগত নয় মোটেই। যদিও অপরিচিত ব্যক্তিরা হঠাৎ শুনে ভেবে ফেলতে পারে, ব্যক্তিগতভাবে আহত হচ্ছে বা আঘাত করতে চাইছে অমলেন্দু।

শিশিরের ওসব বালাই নেই। তার আড্ডায় আসার সময় সবচেয়ে দেরিতে। শিশিরের আসা দেখেই অন্যরা ভাবতে শুরু করতে পারে, এবার ওঠার সময় হল। কিন্তু শিশিরের জেদাজেদিতে এবং কথার তোড়ে আড্ডা আরো খানিক চলে, শেষ চায়ের কাপ এসে পৌঁছয়। এমনিতে শিশির যে খুব বাকপটু তা নয়। তবে উচ্চারণে একটু অন্যরকমের জাদু আছে। তা ছাড়া অন্যকে বসিয়ে রাখার জন্য তাকে

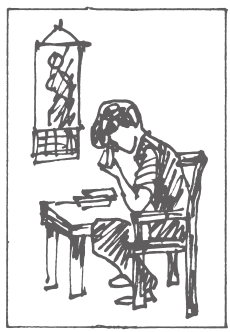

মুকুলের মনখারাপ

মুকুল কয়েক রবিবার আড্ডায় আসে নি। খবর পাঠিয়েছে, অলোকরঞ্জন দাশগুপ্তর গদ্য পড়ে সে নাকি ডিপ্রেশনে ভুগছে। সেদিন গিয়ে দেখি এসেছে বটে আগেভাগে, কিন্তু তার মুখে সেই পুরোনো হাসি নেই, বেজার মুখে বসে আছে।

অমলেন্দুই বরং হাসিমুখে বলল, "এটা তোমার কিন্তু বাড়াবাড়ি। আর অলোকরঞ্জন তো আজই হঠাৎ এ গদ্য লিখতে শুরু করেন নি! তা ছাড়া সুধীন্দ্রনাথের সময় থেকেই দুরূহ গদ্য পড়া কি তুমি অভ্যেস করো নি?"

মুকুল ফোঁস করে বলে উঠল, "আমার সমস্যাটাই বোঝ নি। আমার আপত্তিটা তোমরা যাকে বলো দুরূহ গদ্য, তাতে নয়। গোড়া থেকে বলি, শোনো। সেদিন অলোকরঞ্জনের 'স্থির বিষয়ের দিকে' প্রবন্ধের বইটা নামিয়ে সবে পাতা খুলে বসেছি, চোখে পড়ল (ঝগড়া করবে বলেই যেন মুকুল তৈরি হয়ে এসেছে—ব্যাগ থেকে বের করল

কয়েকটি বই—ফ্ল্যাগ দেওয়া) আধুনিক কোনো কাব্য সম্পর্কে উনি লিখেছেন, 'পারিপার্শ্বিক মৃদায়তন থেকেই একটা সপ্রতিভ প্রার্থনা উত্থিত হয়েছে এই কাব্যে সামঞ্জস্যের কোরক থেকে অবরোহী ঈশ্বরের অভিমুখে। কৃতজ্ঞতা ও অহংকারের মিশ্রিত ধন্যবাদের ভঙ্গিতে উচ্চারিত, নাগরিকতার মূর্ত নীলিমার মতো একটা প্রার্থনা।' ভড়কে গিয়ে অন্য পাতায় যাই। যেখানেই যাই, সেখানেই তাড়া করে (বই থেকে পড়ে-পড়ে শোনায়)—'প্রণিপাত ও পরিপ্রশ্ন জানিয়ে নিজস্ব মননমুদ্রা প্রতিষ্ঠিত করার দুরূহ চাহিদা' কিংবা 'প্রত্যাশিত বিপর্যাসের মুখে জায়মান কবিতার মুখাবয়বে, অত্যন্ত আলতোভাবে একটি নিজস্ব অভিমুখিতার লাস্য আরোপ'। আগের বই 'শিল্পিত স্বভাব' পাড়ি। সেখানেও দেখি 'মানুষের বিনিঃশেষ ধাতুরূপ ও ঈপ্সিত শিল্পরূপের মধ্যে অননূদিত দূরত্বের যন্ত্রণা ও মানবিকতার পুনর্বিচার'। এইসব বেশ খানিকটা পড়তে-পড়তে মনের ভেতরকার ফুর্তিটা কেমন যেন নষ্ট হয়ে গেল। কিছুই ভালো লাগে না, কোনো কিছুতেই স্বাদ পাই না।"

অমলেন্দু তাকে থামিয়ে দিল। "তুমি বলতে চাইছ, ওরকম বানানো কষ্টকল্পিত গদ্য, তাই তো? সেও কি অলোকরঞ্জনের একচেটিয়া? কেন, তুমি দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের গদ্য পড় নি? হাতের কাছে নেই, তা না হলে 'আধুনিক বাংলা কবিতার ইতিহাস' থেকে লাইন পড়ে শোনাতাম তোমার মতো। তবে বাংলাদেশের লেখক বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীরের বই এই তো টেবিলে—পড়ে শোনাব নাকি? তা ছাড়া জনগণের কথা যিনি বলেন সেই দেবেশ রায়ের গদ্য? বিষ্ণু দে-র গোড়ার দিকের গদ্যও কি তাই নয়?"—মুকুল কী একটা আপত্তি করতে যাচ্ছিল, সেটা অনুমান করে নিয়ে—"হ্যাঁ মানছি, ওদের সবার গদ্যকে একশ্রেণীতে ফেলা যায় না—কিন্তু তোমার আপত্তির দিক থেকে বোধহয় এক।"